সাঁওতাল বিদ্রোহ

সরজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলা - বিহারের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পতনের মধ্য দিয়ে দুশো বছরের ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। বক্সারের যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের ফলে ১৭৬৫-তে অসহায় শাহ আলম তাদের বাংলা - বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ খাজনা আদায়ের অধিকার দিতে বাধ্য হন। তার আগেই কোম্পানিরাজ মীরকাশেমের কাজ থেকে পুরস্কারস্বরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এলাকার খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করেছিল। দেওয়ানির অধিকার পাবার আগে থেকেই কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী যথেচ্ছ লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। লুঠতরাজে পিছিয়ে থাকেনি কোম্পানিও। দেওয়ানি লাভ করায় লুঠতরাজ একটি সরকারি স্বীকৃতি পায়। সরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে লুঠের মৃগয়াক্ষেত্র বানিয়ে ফেলা হয় দেশটাকে।

'এটাই স্বাভাবিক। কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এ দেশে মুনাফা লুণ্ঠন করা ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য।'[১]

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দেওয়ানি পাবার পর কোম্পানি প্রথম নজর দেয় রাজস্ব সংগ্রহে। কোম্পানির তরফ থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার পড়ল অত্যাচারী নাজিমের ওপর (বাংলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন মহম্মদ রেজা খাঁ আর বিহারে সীতাব রায় ও দেবী সিংহ)। এঁরা নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালিয়ে জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। জমিদারদেরও লুণ্ঠনের অধিকার দিয়েছিলেন। রাজস্ব আদায়ের সুযোগ নিয়ে এরা নিজস্ব ধন-সম্পদও প্রচুর বাড়িয়ে নিয়েছিল। মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার নিয়ম ধার্য হওয়ায় কৃষকদের সুদ সংগ্রহের জন্য ফসল বিক্রি করতে হত। কৃষকদের ঘরে দেখা দিল অন্নাভাব। দেওয়ানি লাভের পাঁচ বছরের মধ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং জগৎশেঠ ও উমিচাঁদের মতো ধনী ব্যবসায়ীরা পরামর্শ করে সমস্ত ফসল কিনে নিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে) নামে খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশে অর্থাৎ প্রায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।

মোঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে কোম্পানি এক নতুন ভূমিব্যবস্থা চালু করতে চাইছিল। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এর মধ্যে বৃদ্ধি পেলেও, আদায়ের পদ্ধতিকে একটা সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। কোম্পানি এই সুষ্ঠু ব্যবস্থাটা কি হতে পারে তার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল নিয়মিত ও স্থায়ী এক রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা চালু করতে। এর জন্যে পরপর কয়েকটা আইনও চালু করা হল। প্রথমে দো-শালা তারপর পাঁচ - শালা এবং ১৭৯০ সাল থেকে দশশালা বন্দোবস্ত চালু করা হয়। কিন্তু তাতেও রাজস্ব ব্যবস্থাকে নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়নি। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশের পরিকল্পনা মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে জমিদারেরা আদায়ীকৃত রাজস্বের নয় - দশমাংশ কোম্পানিকে দেবে। বছরের নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ডোবার আগে রাজস্ব জমা দিলেই জমিদারেরা জমির স্বত্বাধিকারী থাকবেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ দেশের ভূমিব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটালো। যে জমিতে ছিল কৃষকের পুরুষানুক্রমিক অধিকার — মোঘলযুগেও যে অধিকার অক্ষুণ্ণ থেকেছে, এবার সেখানে হাত পড়ল। কলমের এক খোঁচায় জমির অধিকার বর্তাল জমিদার নামক দেশীয় খাজনা আদায়কারীদের ওপর। জমি পরিণত হল পণ্যে। এমন এক পণ্য যা সরকারকে নিয়মিত স্থায়ী রাজস্বের যোগান দিয়ে যায়। জমিদারদের দিক থেকেও জমি এক লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হবে দাঁড়াল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো একেবারেই নতুন এই ব্যবস্থা চালু করা হল দেশে কোনরকম জমি জরিপ ছাড়াই। বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর্বে কোম্পানি দেশে কোন জরিপ করেনি। কাজেই যে সমস্ত জমি তখন পর্যন্ত অনাবাদী ছিল সেগুলো পর্যন্ত জমিদারদের দখলীভুক্ত হলো এবং এর ফলে তারা ভালো আবাদযোগ্য জমি থেকে শুরু করে অনেক সমৃদ্ধ বন অঞ্চলের মালিক হয়ে বসল।'[২]

জমিদার নামে এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হল গ্রাম বাংলায়। বাংলার কৃষক জমির ওপর তার স্বত্ব-স্বামিত্ব সব হারাল। রাজস্ব বৃদ্ধি করা ছাড়াও এই শ্রেণি আপদে - বিপদে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করবে এই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য; কারণ এদের স্বার্থ ইংরেজ-রাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। লর্ড কর্নওয়ালিশ বা ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছেও ছিল তাই। 'আর্থিক প্রয়োজনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে একটা নির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও এই বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'[৩] সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে 'কৃষকদের দমনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোম্পানির ফৌজের ওপর নির্ভর না করে তারা এমন একটি শ্রেণির সহায়তা লাভ করতে চেষ্টা করেছিল যাদের স্বার্থ ব্রিটিশরাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে একই গাঁটছড়ায় বাঁধা থাকবে।'[৪]

দেশীয় ভূস্বামী এবং তাদের পরবর্তী স্তর গাতিদার, পত্তনদার প্রমুখ চিরদিন প্রথমে কোম্পানিরাজ এবং পরে সরাসরি বৃটিশ সরকারের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট থেকেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর সাঁওতাল কৃষকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যেসব জমি চাষ করে আসছিল সেগুলি রাতারাতি জমিদারদের হাতে চলে যায়। এর ফলে খাজনা বাড়ানোর জন্য চাপ আসতে থাকে। নতুন এই ব্যবস্থায় সাঁওতালরা বিব্রত বোধ করে। স্বভাবে শান্তিপ্রিয় হওয়ায় তারা কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলা থেকে সরে যেতে শুরু করে।[৫] Sir George Cambell তাদের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তারা প্রকৃতই মনে করে জমি তারই যে তা প্রথম চাষ করে। তারপরও যদি তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় তবে তারা বরং আরও হঠে গিয়ে জঙ্গলে চলে যাবে এবং সেখানে নতুন আবাদ গড়ে তুলবে যেখানে তাদের উৎপীড়ন করার কেউ থাকবে না। দুর্ভাগ্যবশত তারা এইভাবে সরে যেতে যেতে চরম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং বর্তমানে গাঙ্গেয় সমতলের সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেখানে জমির লড়াই তীব্রতর এবং খাজনার গুরুভার খুব বেশী সেখানে তারা উপনীত হয়'।

বাংলা - বিহার সীমান্তের ভাগলপুর ও বীরভূম এলাকায় বিস্তীর্ণ পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্ঠিত প্রস্তুরভূমি দাখিন -ই-কো বা দামন নামেই পরিচিত ছিল। দাখিন-ই-কো কথার অর্থ হচ্ছে পাথরের ওড়না। সেখানে কিছু পাহাড়িয়া আদিবাসী পাহাড়ের ওপর বসবাস করত। বাকি সমতল এলাকা ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে সাঁওতালগণ ১৭৯০ সাল থেকেই এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে বসতি গড়ে তুলতে থাকে। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের জমিসমূহ তাদের নিজস্ব জাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন তাতে স্বল্পসংখ্যক মাত্র সাঁওতাল থাকার কথা উল্লেখ আছে।

১৮৩২-৩৩ খ্রিষ্টাব্দে John Petty Wood -এর নেতৃত্বে সার্ভেয়ার Captian Tanner দামন -এর সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেন। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার ১৩৬৬.১ বর্গমাইল ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল শুধু পাহাড়। আবার ৫০০

বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ২৫৪ বর্গমাইল এলাকা ছিল গভীর জঙ্গল।[৭] এই সময় অর্থাৎ ১৮৩২ সালে দেখা গেল যে বহুসংখ্যক সাঁওতাল অপর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ দামন - সীমানার মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে। পাহাড়িয়া জাতিরা উচ্চ পাহাড়িয়া জঙ্গলে থাকতে ভালবাসে। তারা উর্ব্বর নিম্নভূমিতে ভূমি কর্ষণের কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। সাঁওতালগণকে পরিশ্রমী ও কৃষিকার্যে অনুরক্ত দেখে কোম্পানিরাজ তাদের দামন অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অবস্থান করতে কোনরূপ আপত্তি করলেন না; পরন্তু ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য James Pontel নামক একজন প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। এইবার সাঁওতালদের যাযাবর বৃত্তির কতক পরিমাণ অবসান হল।[৮] বড়লাট Lord William Bentink জঙ্গল এলাকা সাফ করে সাঁওতালদের বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান। ফলতঃ কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম এলাকা থেকে দলে দলে সাঁওতাল কৃষকরা দামন অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপন করেন।[৯]

'সাওতালরা প্রথম গ্রাম প্রতিষ্ঠা করলো দামিন-ই-কোহর পূর্বদিকে সড়কডাঙায়। তারপর পিপড়া ও আমগাছিয়াতে আস্তে আস্তে গ্রামের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।[১০] একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে অন্তত ৪২৭টি গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ১৮৫১-তে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৭৩ আর জনসংখ্যা হল প্রায় ৮২.৭৯৫।[১১]

এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে কোম্পানি সাঁওতালদের কেন আহ্বান জানাল। কারণ দুটি। প্রথমত এর উত্তর মেলে ভাগলপুরের কালেক্টর Dunbor -এর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, কোম্পানি জানতে চেয়েছিল জমি থেকে এখন কত লাভ হয়; দ্বিতীয়ত, কোম্পানির একটি পবিত্র ইচ্ছা ছিল। সাঁওতালদের নির্দিষ্ট ধর্মমত না থাকায় তাদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা সহজ হবে; এর জন্যই কোম্পানির উৎসাহ দান, সাদর আহ্বান।[১২]

সাঁওতালেরা দামনে ভিড় জমিয়েছিল অনেক স্বপ্ন নিয়ে। অচিরেই তাদের ভুল ভাঙল। ভেবেছিল, দিনানুদৈনিক জীবনযাপন হবে প্রথা অনুযঙ্গে, পর্ব-পার্বণে। আর থাকবেন, গ্রামমাঝি, পারবণক, পারগানা ও দেশমাঁঝি। যাঁরা বন্ধনে বাঁধবেন এক নিটোল সমাজ। কিন্তু সাঁওতালদের মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। কারণ, কোম্পানিরই খাজনা-নীতি।

দামন-অঞ্চল মূলত পাহাড়িয়া জাতির জন্য সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সাঁওতালরা যদিও এর নিষিদ্ধ গন্ডির মধ্যে প্রবেশলাভের অধিকার পায়, কিন্তু পাহাড়িয়াদের মতো অন্যান্য কোনো বিষয়েই তুল্যরূপ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়নি। দামনের সৃষ্টির সময় থেকে পাহাড়িয়াদের জন্য কোনো রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল না। যখন সাঁওতালদের দামনে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করার জন্য উৎসাহিত করা হয় তখন সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তাদের প্রথম তিন বছর কোনো খাজনা দিতে হবে না, পরে খাজনা দিতে হলেও তা খুবই সীমিত হারে ধার্য করা হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হল না। সাঁওতালদের কর্ষিত জমির কোনরূপ পরিমাপাদি না করেই কেবলমাত্র মৌজায় বিভক্ত করে James Poteul সাঁওতালদের কর্ষিত জমির ওপর খাজনা নির্ধারিত করলেন এবং এই খাজনার হার ক্রমশই বাড়িয়ে চলে কোম্পানিরাজ। কালিকিঙ্কর দত্তের হিসাব অনুযায়ী দামন থেকে ১৮৩৮ সালে বাৎসরিক দুহাজার টাকা খাজনা আদায় হত। ১৮৪১ সালে সেটাই বেড়ে হয় ৪৩,৯১৮ টাকা, ১৩ আনা ৫ $^{১}/_{২}$ পয়সা।[১৩]

মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কি বিপুল পরিমাণ খাজনার বোঝা সাঁওতাল কৃষকদের ওপর চাপানো হল ভাবলে অবাক হতে হয়। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে জমিদারের নায়েব, পেয়াদা, গোমস্তারা খাজনার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ বিভিন্নভাবে আদায় করত। অতিরিক্ত অর্থ দিতে অসমর্থ হলে নানাভাবে অত্যাচার করা হত বা জমিছাড়া করা হত। বলা বাহুল্য আদায় ও জুলুমের ক্ষেত্রে জমিদারেরা ছিলেন ইংরেজের সহযোগী।

বস্তুতঃ সেই একই মানসিকতাসম্পন্ন জমিদারগোষ্ঠী যারা সাঁওতালদের তাদের নিজেদের জমি থেকে বিতাড়িত করেছিল কিছু কাল আগেই, তারা খুব শীঘ্রই তাদের আবার হেনস্থা করতে শুরু করল। যতদিন বনভূমি পরিষ্কার হয়নি ততদিন জমিদাররা চুপ করে বসে ছিল। যেই ওইসব বনভূমি বসতযোগ্য ও আবাদযোগ্য হল তখন আর জমিদাররা ওই সব জমির মালিকানা দাবি করতে বিলম্ব করেনি এবং খাজনা চাইতে শুরু করে। ১৯৫৬-র ক্যালকাটা রিভিউ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় 'দামনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী লোভী জমিদাররা তাদের জমির লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল'।[১৪]

সাঁওতাল কৃষকরাই দামনের চেহারা পালটিয়ে দিল। অফুরন্ত ফসলে ভরে উঠল মাঠ। এই ফসলের লোভে আস্তে আস্তে আসতে আরম্ভ করল ব্যবসায়ী ও মহাজনরা। সেই মোঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকেই রাজমহল পাহাড়ের নিম্নদেশ সুবা বাংলা অন্তর্গত হবার ফলে অনেক বাঙালী এই অঞ্চলে অনেককাল ধরেই বসবাস করত। ''ক্রমে ক্রমে ময়রা, বেনিয়া ও অন্যান্য শ্রেনির আরও বহু বাঙালী পরিবার বর্ধমান ও বীরভূম জেলা থেকে এসে উপস্থিত হল। মহাজনি ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবাধ সুযোগে আকৃষ্ট হয়ে সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভোজপুরি, ভাটিয়া প্রভৃতি পশ্চিমী ব্যবসায়ীরা দলে দলে দামিন -ই-কোহ্ অঞ্চলে এসে জেঁকে বসল। পাহাড়ি অঞ্চলের 'প্রধান শহর' (১৮৫১ সনে) বারহাইত (ই আর রেলওয়ের লুপ লাইনের বারহারোয়া রেল ষ্টেশনের প্রায় ১৩ মাইল - পশ্চিমে অবস্থিত) ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং এখানে একটি বাজার ছিল এবং সপ্তাহে দুবার হাট বসত। বহু বাঙালী মহাজন (ব্যবসায়ী ও সুদের কারবারিরা) বারহাইতের বাজার থেকে সাঁওতাল পরগণার বিপুল পরিমাণ ধান, সরিষা ও বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ গোরুর গাড়ি বোঝাই করে ভাগীরথীর তীরবর্তী জঙ্গিপুরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে প্রথমে মুর্শিদাবাদে ও কলকাতায় এবং পরে অধিকাংশ সরিষা ইংল্যান্ডে রপ্তানি করত। এ সকল শস্যের পরিবর্তে সাঁওতালদের দেওয়া হত সামান্য অর্থ, নুন, তামাক অথবা কাপড়। দুমকা মহকুমার কাথিকুন্ডে বসবাসকারী কিছু বাঙালী শস্য ব্যবসায়ী সাঁওতালদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বহু অল্পমূল্যে সরিষা ও ধান নিয়ে আসত। তারা এই শস্য সিউড়িতে চালান দিত।[১৫]

সাঁওতাল সমাজে তখন বিনিময় প্রথাই প্রচলিত ছিল। আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তারা ফসলের দাম সম্পর্কে কিছুই বুঝতো না। ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে ফসল তাদের কাছ থেকে সস্তায় কিনে চড়া দামে চালানও করত। সাঁওতালদের অত্যন্ত পরিশ্রমে উৎপন্ন শস্যের প্রায় সমস্ত অংশই পৌঁছে যেত ইংরাজ বণিকদের কুঠি, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের গুদামে। ফলে সাঁওতালদের প্রয়োজনীয় অন্নের টান পড়তে লাগল।

এইভাবে ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা করতে লাগল। এই অতিরিক্ত আয়কে তারা বিনিয়োগ করতে লাগলো মহাজনী ব্যবসায়। খাজনা দেবার জন্য (ফসলে না দিয়ে নগদে খাজনা দেওয়ার হুকুম), পিতামাতার মৃত্যু হলে পারলৌকিক কাজকর্মের জন্য, কিংবা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি অথবা কোনো কারণে বেহিসেবি খরচ করার ফলে মহাজনদের কাছে হাত পাততে বাধ্য হচ্ছিল সাঁওতালরা। ঋণ দিয়ে অনেক বেশী পরিমাণ লিখিয়ে নেওয়া ছিল রীতি। সুদের হার ছিল অকল্পনীয়। কোথাও কোথাও তা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৫০০ টাকা। ব্যবসায়ী-মহাজনরা ঋণ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত সব সময়। তারা সুযোগ খুঁজত কি করে এই সাঁওতালদের ঋণের

জালে আবদ্ধ করা যায়। মহাজনদের নিকট সামান্য দেনা করলেও সে দেনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

ক্যালকাটা রিভিউ লিখেছে, একজন সাঁওতাল ঋণ নিলে তার ঋণের জন্য জমির ফসল, লাঙল, বলদ এমনকি নিজেকে তো বটেই, তার পরিবারকেও হারাতে হত। ঋণ শোধ হলেও মুক্তি ছিল না কারণ সুদের হার ছিল পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ শতাংশ।[১৬]

এই প্রসঙ্গে W.W.W. Hunter বলেছেন, 'যে মুহূর্তে কোনো সাঁওতাল জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করত সেই মুহূর্ত থেকেই সেই হতভাগ্য সাঁওতাল জমিদার-মহাজনের শোষণ -জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। সমস্ত বৎসর সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন জমিদার বা মহাজন তার সমস্ত ফসলই নিজের গোলায় তুলত। বৎসরের পর বৎসর এভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাঁওতালটি তার শোষকের জন্য খেটে মরত। যদি কখনও সে অতিষ্ঠ হয়ে জঙ্গলে পালাবার চেষ্টা করত তখনই পূর্বে কোনরকম সতর্ক না করেই পেয়াদা ও পাইক এসে দরিদ্র সাঁওতালের গরু, মহিষ, বাসন - কোসন ও অন্যান্য গৃহস্থালির জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যেত। এমন কি স্ত্রীলোকের সম্মানের চিহ্ন লোহার বালাও বাদ যেত না। স্ত্রীলোকের হাত থেকে সেগুলি জোর করে কেড়ে নেওয়া হত।"[১৭]

যখন ফসল পেকে সময় হত কাটার এই মহাজনেরা বলদ বা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বেরিয়ে পড়ত সারা বছরের আদায়ে। পথে পাশের টিলা থেকে তুলে নিত ভাল দেখে একটা পাথরের টুকরো; সিঁদুর মাখিয়ে চেষ্টা করত বিশুদ্ধতা আনতে। তারপর পৌঁছে যেত সেই দুর্ভাগা মানুষগুলির বাড়িতে। যেখানে পাওনাদার অরা তার লোকলস্করদের থাকা-খাওয়ার খরচ বইত ওই হতভাগ্যরাই।[১৮]

তারপর ওজনের সময় 'বিশ' আর হয় না। এদিকে সাঁওতালরা কুড়ি বা বিশের বেশী গুনতে পারতো না। এই অক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উনিশ পর্যন্ত ফসল মেপে আবার এক থেকে শুরু হত। বিশ আর অত না। এদিকে সাঁওতালের ফসল তো নিঃশেষিত। তাই অবাক হয়ে তারা বলত 'বিশ বোল বাবু বিশ বোল'। এইভাবেই পাথুরে জমিতে অশেষ পরিশ্রমে যে ফসল ফলে উঠেছিল— যে ফসলকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছিল বন্য হাতির দল, শুকুর, হরিণ, নানান জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে অপরিসীম মমতায়— তার সবটাই যেত মহাজনের কবলে।

এছাড়াও মহাজনদের হাতে সব সময়ই দুই ধরনের ওজন মাপার ঝুড়ি থাকত। যে ঝুড়িতে সাঁওতালদের কাছ থেকে ফসল কেনা হত সেটা ছিল সঠিক মাপের চেয়ে বেশ একটু বড়। এর নাম ছিল কেনারাম বা বড়বউ। আর যখন কোনকিছু বিক্রি করত তখন তারা ব্যবহার করত অন্যটা যেটার সঠিক ওজন থেকে কম ধরত— তাকে বলা হত বেচারাম বা ছোটবৌ।[১৯]

মহাজনরা তাদের ঋণ আদায়ের জন্য সঙ্গে রাখত লাঠিয়ালদের। জোর করে খাতকের ঘরে প্রবেশ করে তারা গৃহস্থালির ব্যবহার্য জিনিস, এমন কি গরু, ছাগল, মুরগি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত। ঋণ তবু শোধ হত না। এই অজুহাতে কখনো কখনো স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ মহাজনের জমিতে বাড়িতে বেগার দিতে যেতে হয়েছে। প্রতিকারের কোনো উপায় কোথাও ছিল না। কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার সাধ্য সাধারণ সাঁওতালের ছিল না। যদি বা যেত নাজেহাল করে দিত আদালতের কর্মচারীরা। এসব পেরিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছানো গেলেও, গরিব সাঁওতালদের কথা তাঁর কানে পৌঁছত না। মহাজন অনেক আগেই সাহেবকে হাত করে ফেলত। তাঁর সম্পদ ও প্রভাবে অনেক সময় উলটে সাজা হয়ে যেত সাঁওতালদেরই, আর তাদের ঠকিয়ে কিংবা তাদের থেকে কেড়ে লুণ্ঠন করে নেওয়া সম্পদে আরো ধনী হয়ে উঠেছে জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা। সহজে ধনী হবার জন্য তখন কোনো একটা সাঁওতাল গ্রামের মহাজন হওয়াই যথেষ্ট ছিল। কালিকিঙ্কর দত্তের লেখা থেকে পাই 'বারহাইত ও হিরণপুর (পাকুর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) এই দুই কেন্দ্রে সাঁওতালদের দেওয়া সুদে অতি অল্প সময় এক শ্রেণির ধনী মহাজন সৃষ্টি হয়েছিল।[২০]

জমিদার -মহাজনদের অত্যাচারী ভূমিকায় সহযোগী ভূমিকা পালন করত থানার দারোগা। এরা সমস্ত জায়গাতেই উৎকোচ নিয়ে জমিদার - মহাজনদের পক্ষ নিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। নীলকর সাহেবরা প্রচলিত কোনো আইনের ধার ধারত না। প্রতিবাদ করলে জুটত প্রহার বা অন্য কুঠিতে স্থানান্তর। এভাবেই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সাঁওতাল কৃষকদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় গুমরে মরছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হল রেলের ঠিকাদার ও কর্মচারীদের অত্যাচার। এ সময়ে রামপুরহাট অঞ্চলে কোম্পানিরাজ রেললাইন স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। প্রায় হাতে - পায়ে ধরে রেলপথ পাতার জন্য এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিদের নিয়ে এসে কাজ শুরু হল। সস্তায় সহজলভ্য শ্রমের জন্য সাঁওতালদের রেললাইন পাতার কাজে নিয়োগ করা হয়। 'রেলপথে যে সমস্ত ইংরাজ কর্মচারী কাজ করত, তারা বিনামূল্যে সাঁওতাল আদিবাসীদের কাছ থেকে জোর করে ছাগল, মুরগী প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে যেত এবং সাঁওতালরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর অত্যাচার করত। দুজন সাঁওতাল - স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার ও একজন সাঁওতালকে হত্যা করাও হয়েছিল।[২১]

সাঁওতাল সমাজের ওপর ইংরাজ শাসক, কোম্পানীর কর্মচারী, জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন, দারোগা-পুলিশ, রাজস্ব আদায়কারী ও আদালতের আমলা কর্মচারীরা সকলে মিলে যে অত্যাচার অবিচার চালাচ্ছে সে সম্বন্ধে ইংরাজশাসকরা মোটেই অজ্ঞ ছিল না। ''ইংরেজ বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটরা রাজস্ব আদায়ে এতই মত্ত থাকতেন যে ছোট ছোট বিষয়ে মনোনিবেশ করার মতো এদের সময় থাকত না। দেশীয় আমলারা ছিল তাদের হাতের পুতুল, আর পুলিশ পেত লুটের অংশ।[২২] Pontel-এর কাছে অভিযোগ এসেছিল ৬৭টি। তার মধ্যে সুদের চড়া হার এবং ওজনে ঠকাবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল।[২৩] কিন্তু Pontel নিজে এ সব অভিযোগের কোনও তদন্ত করলেন না, যারা দুস্কৃতকারী সেই নায়েব - সুজাওলাদের কাছে তিনি এই দরখাস্ত গুলি পাঠিয়ে দিতে লাগলেন বিচারের জন্য"। ফলে, সাঁওতালেরা বুঝতে পারল Pontell এর কাছথেকে ন্যায়বিচারের কোনো আশা নেই। নরসিং মাঁঝি ও কদবু মাঁঝি ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে এক নালিশপত্র পাঠান। এই পত্রে তাঁরা লেখেনঃ 'দামিনে বসবাসকারী মহাজনরা নিজেদের লাভের জন্য সাঁওতালদের দু-চার টাকা ধার দেয়। এর জন্য তারা চড়া হারে সুদ নেয় এবং বলপ্রয়োগ ও অত্যাচার করে তা আদায় করে। ফসলের মাধ্যমে যখন এই ঋণ পরিশোধ করা হয়, তখন তারা নিজেরাই তা ওজন করে এবং আমাদের মতো জংলীরা হিসাবপত্তর ও তাদের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায়, যা খুশি তাই করে। শুধু তাই নয়, ঋণ আদায়ের ছুতোয় মহাজন যখন তখন আমাদের ঘরে ঢোকে এবং মুরগি, ছাগল যা পায় জোর করে নিয়ে যায়। ৪০/৫০ টাকা ঋণের খত তৈরী করে তারা সাঁওতালদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে মিথ্যা চুরি - ডাকাতির অভিযোগ এনে আমাদের নাস্তানাবুদ করে। এ ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট সবার কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি। মহাজনের অত্যাচারে অনেক সাঁওতাল তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। অন্যরাও যাবার জন্য প্রস্তুত। আমরা যখন প্রথম এদেশে আসি, জঙ্গল কেটে আবাদযোগ্য করি, সরকারি কোষে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা করি, তখন সরকার আমাদের ভালো চোখে দেখত। এই সময় আমাদের সুরক্ষার জন্য তারা ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন পাশ করে। এখন সরকারি আইনকে গ্রাহ্য না করে মহাজনরা যদি এইভাবে অত্যাচার করে এবং সরকার যদি আমাদের রক্ষার কোনো ব্যবস্থা না করে, তা হলে আমরা কীই বা করতে পারি? যদি এর কোনো প্রতিবিধান না হয়, তা হলে আমরা জঙ্গলভূমি ত্যাগ

করে চলে যাব এবং গোটা এলাকাটি আবার জঙ্গলপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমাদের প্রার্থনা, এ বিষয়ে সুপারের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হোক এবং মহাজনের অত্যাচার বন্ধের ব্যবস্থা করা হোক। সরকার ছাড়া আমাদের রক্ষার কোনও উপায় নেই। তাই আমাদের নিবেদন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক, মহাজনদের দামিন থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক, যাতে তাদের কবল থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি'।

এই আবেদন পাবার পরও কিন্তু সরকার মহাজনদের গ্রাস থেকে সাঁওতালদের রক্ষার তেমন কোনো ব্যবস্থা করেনি। মহাজনরা যে বাড়াবাড়ি করছে, সরকারি কর্তৃপক্ষও তা বুঝতে পারে। তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবস্থাই রয়ে গেল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। ফলে সাঁওতালদের অবস্থা থেকে গেল অপরিবর্তিত।

ইংরেজদের অত্যাচারে সাঁওতালদের স্বাধীনতা গেছে। মহাজন তাদের গ্রামসমাজ ভেঙে দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। সংগীত ছাপিয়ে উঠেছে কান্না। মাদল বিকিয়ে গেছে দেনার দায়ে। একটি জাতির বিদ্রোহী হয়ে ওঠার জন্য এর চেয়ে বেশী কোনো কারণের প্রয়োজন হয় কি?

যদিও খ্রিষ্টাব্দ ১৮৮৫, ৩০শে জুন থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। যাবতীয় দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মহাজনদের বজ্রমুষ্ঠি থেকে পালানোর পথ খুঁজতে মরিয়া সাঁওতালরা নানান ছোটখাটো সভা আয়োজন করতে লাগল। শুরু হল বিক্ষোভ। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমদিকে এইরকম যখন পরিস্থিতি, লচিমপুরের সাসানের পরগনাইত বীরসিং একদিন ঘোষণা করলেন যে তাঁদের প্রধান দেবতা চান্‌দো বোঙ্গা তাঁর সামনে অবির্ভূত হয়ে তাঁকে এক জাদুমন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। এই জাদুমন্ত্র পাঠ করলেই যে কোনও মানুষকে ঘুম পারিয়ে তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যাবে। নিতান্ত অজ্ঞ সাঁওতালদের কাছে এ কাহিনির তাৎপর্য ছিল বিরাট। প্রতিদিনই তারা বীরসিং পরগনাইতের কাছে গিয়ে শিখতে আরম্ভ করল ওই আশ্চর্য যাদুমন্ত্র। বীরসিং-এর শিষ্য ছাড়াও বোরেসের আর একজন বীরসিং মাঝি, সিন্দ্রির কাওলেক পারমাণিক, লচিমপুরের সাতবান্‌ধার ডোমন মাঁঝি সুদক্ষ হয়ে উঠল অচিরেই।

বীরসিং পরগনাইত-এর নেতৃত্বে দল গড়ে উঠল। যে ময়রা - দিকুরা (সাঁওতালরা বাঙালীদের এই নামে ডাকত) শকুন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত এদের দিকে তারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল সাঁওতালদের রাতের জমায়েত লক্ষ করে। মাদলাগঞ্জ (দিঘি) থানার দারোগা মহেশলাল দত্তকে গোপনে তারা খবর পাঠাল যে প্রতি রাত্রেই সাঁওতালরা একসাথে হয়ে শলাপরামর্শ চালাচ্ছে। তাই এখনই কঠোর কোনো ব্যবস্থা না নিলে এখানে আর বাস করাই যাবে না। কিন্তু দারোগা কোনো ব্যবস্থা নিল না। তখন তারা অমবা পরগণার জমিদার রাণী ক্ষেমাসুন্দরীর (পাকুড়রাজ) শরণাপন্ন হল। রানীর দেওয়ান জগবন্ধু সাই সাঁওতালি গ্রামের নায়েবকে ব্যাপারটা দেখতে নির্দেশ দিলেন। একদিন সেই নায়েব বীরসিংকে জমিদারের কাছারিতে ডাকিয়ে এনে এক বিরাট অঙ্কের জরিমানা চাপিয়ে দিল তার ওপর। বীরসিং জানালো সে একেবারেই নির্দোষ আর জরিমানা মেটানোর কোনো ক্ষমতাই তার নেই। এই শুনে অনুগামীদের সামনেই তাকে জুতো দিয়ে নির্দয়ভাবে মারল নায়েব। অপমানিত বীরসিং এবং তাঁর অনুগামী সাঁওতালদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। ধনী মহাজনদের অত্যাচারের বদলা হিসাবে তাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে শুরু করল।[২৫] এই ডাকাতির ঘটনাগুলিকে তখনকার এক প্রতিবেদনে বলা হয় এ হল মহাজনদের নিষ্কর অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ।[২৬]

গোলযোগ শুরু হল কুসমা গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়ি লুঠ করে। মহাজন পরদিন থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের কাছে খবর পাঠায়। সেখানে ভজা পরগনাইতের ভাই গোচ্চো বাস করত। গোচ্চো ছিল ধনী সাঁওতাল। তাঁর টাকার উপর মহাজনদের বিশেষ লোভ ছিল। তারা দারোগার কাছে গোচ্চোর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনল। দারোগা গোচ্চোকে অপমান করায় তিনি বললেন, 'শয়তান দারোগা যে সমস্ত শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের চালান দিতে চায়, তাদের বাঁধবার জন্য কত দড়ি জোগাড় করতে পারো দেখব।[২৭]

দারোগা অবশ্য গোচ্চো বা তাঁর দলকে কাউকেই তখনি গ্রেপ্তার করতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরের বছর মহাজনদের প্ররোচনায় ও নির্দেশে মহেশ দারোগা গোচ্চো ও তাঁর দলের অনেক সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করে ও কঠোর সাজা দেয়।[২৮]

ডাকাতি ও গোলযোগ দমনের নামে মহেশ দারোগা সাঁওতাল কৃষকদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছিল এবং যে ভাবে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা করছিল তাতে তাদের ক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। তাই ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দেবর গোড়ার দিকে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ থেকে ছ-সাত হাজার সাঁওতাল এসে দামনে জমায়েত হয়। তাদের আসার উদ্দেশ্য ছিল আগের বছরে তাদের সাথীদের উপর যে পীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং বীরসিংকে যেভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া। তারা তাদের সরল যুক্তি দেখিয়ে বলে ডাকাতি হয়েছে ধনী মহাজনদের বাড়ি। মহাজনরা আগে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পীড়ন করেছে। ডাকাতির জন্য তাদের সাজা দেওয়া হল অথচ যে মহাজনদের শোষণ ও জুলুমের কারণে তারা আইন ভঙ্গ করেছে তাদের কোন শাস্তি হল না।[২৯] যে সমাজ ব্যবস্থায় শোষক শ্রেণিদের শোষণের অবাধ সুযোগকে বজায় রাখাই তাদের শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য, সেখানে তাদের এই সহজ ও সরল যুক্তি যে অচল তা তারা বোঝেনি। তাই এই অবিচার তাদের সহ্য হল না।

পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠছিল। সাঁওতালরা তাদের সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। সকলেই ভাবছিল এখনই একটা বিহিত ব্যবস্থা দরকার। দরকার ছিল খালি একটা স্ফুলিঙ্গের যা এল ভগানডিহি গ্রামের দুই ভাই সিদো ও কানহুর মাধ্যমে।

তখন বারাইতের নিকটবর্তী ভুগনাডিহি গ্রামে বাস করতেন চুনার মুর্মর চার ছেলে —কানহু বা কানু, সিদো বা সিধু, চাঁদ এবং ভৈরো বা ভৈরব। কানহু চার পুত্রের মধ্যে বয়সে বড়। বিদ্রোহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫। ১৮২০ সাল নাগাদ জন্ম হয়। দিদোর বয়েস ছিল ৩২-৩৩, চাঁদের ৩০ এবং সবচেয়ে ছোটো ভৈরবের বয়স ছিল ২০। সিদো ছিলেন ঢেঙে, মাথায় লম্বা চুল এবং গায়ের রঙ সাঁওতালদের তুলনায় বেশ ফিকে। অল্পবয়সেই এঁরা পিতৃহীন হন। সকলেই কৃষক। পূর্বে তাঁদের অবস্থা সচ্ছল ছিল কিন্তু সেবার ফসল না হওয়ায় মহাজনের দুয়ারে যাবার পর দেনার দায়ে তাঁদের পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস হয়েছিল। সাঁওতালদের অবস্থা কি ভাবে উন্নত করা যায় কীভাবে মহাজন ও অন্যান্য অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের রক্ষা করা যায় তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভাবনাচিন্তা করছিলেন কানহু এবং তাঁর ভাই সিদো। অনেক চিন্তা - ভাবনার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, সাঁওতালদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই এই সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাও তাঁরা বুঝতে পারলেন। এই কর্মকাণ্ডে গোটা সাঁওতাল সমাজকে সামিল করতে না পারলে যে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তাও তাঁরা উপলব্ধি করলেন। তবে একেবারে সরাসরি বিদ্রোহের ডাক না দিয়ে সিদো-কানহু একটু কৌশলের সাহায্য নিলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে ঠাকুর স্বয়ং তাঁদের দেখা দিয়েছেন। তিনি কানহু আর সিদোকে সাঁওতালদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরাসরি সরকারকে জমা দিতে বলেছেন। মোষের লাঙলের জন্য দুপয়সা খাজনা ধার্য করে দিলেন তিনি বললেন, দামনের জমি সমস্ত সাঁওতালদের মধ্যে

সমভাবে বন্টন করতে হবে, মহাজনদের এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে হবে এবং জমিদারদের বসতবাড়ি ছাড়া অন্য সব সম্পত্তি কেড়ে নিতে হবে। সাঁওতালদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য সিদো - কানহু ঘোষণা করলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছেন।[৩০] ঈশ্বরের আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সিদো - কানহু ঠাকুরের এক মূর্তি নির্মাণ করে বাড়িতে বসালেন এবং ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা করলেন। ঐশ্বরীয় প্রত্যাদেশ সকল গৃহে জানান হয় ঐতিহ্যগত শালশাখা' শারিসারজাবম' (Sal tree the truth) এর মাধ্যমে। একজন ইংরেজ লেখক ঘটনার এক যুগ অন্তরেই লিখলেন, সেই ছিল যুদ্ধ সংকেত 'their signal for war'।[৩১] সাঁওতালদের জমায়েতের জন্য একটি দিনও ঠিক হল।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে জুন ভাগনাডিহির ঘাটে ৪০০ গ্রামের প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল জমায়েত হয়। সেই ঐতিহাসিক জনসভায় সিদো ও কানহু তাদের অত্যাচারীদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার যে ঐশ্বরীয় আদেশ হয়েছে তা ঘোষণা করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হল 'হুল' বা বিদ্রোহ করার। তারা জমিদারদের কোন খাজনা দেবে না, নিজেদের রাজ কায়েম করবে।

''সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা বাঙালী ও পশ্চিমী মহাজনদের উচ্ছেদ করে এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল করে নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করবেন। কুমার (কুম্ভকার), তেলি, কর্মকার, মোমিন (মুসলমান তাঁতি), চামার (চর্মকার) প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোকেদের কোনরকম আক্রমণ করা হবে না বলে স্থির করা হয়। কারণ, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তারা সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।[৩২]

সভার আলোচ্য সমস্ত বিষয় সংবলিত এক পত্র লেখবার ব্যবস্থা করা হয়। সিদোর নির্দ্দেশে কীতা মাঁঝি, ভাদু মাঁঝি, ও সন্নো মাঁঝির লিখিত সেই পত্র পাঠানো হয় ইংরেজ সরকার, ভাগলপুরের কমিশনার, ভাগলপুর ও বীরভূমের সমাহর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের, দিঘি (বাদশাগঞ্জ) ও রাজমহল থানার দারোগাদের এবং কয়েকজন জমিদার ও অন্যান্যদের কাছে। জমিদারদের এবং দারোগাদের চিঠিগুলি ছিল চরমপত্র। তাতে লেখা হল ১৫ দিনের মধ্যে জবাব চাই।[৩৩] কিন্তু কেউই চিঠির কোন জবাব দেয় না।

সিদো - কানহুর সময়ে কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী, বিদ্রোহীরা তাদের বাহিনী নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। অভিযাত্রী - বাহিনীর ধারণা ছিল কলকাতায় গিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেই তাদের সব সমস্যার সমাধান হবে। তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের মেয়ে ও শিশুরাও ছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই প্রথম গণ পদযাত্রা।

ডঃ কালিকিঙ্কর দত্তের মতে, ''এই আন্দোলন প্রথম দিকে ব্রিটিশ - বিরোধী ছিল না। প্রধানত মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। সাঁওতালরা প্রথমেই ঘোষণা করে যে তাদের ভগবান আদেশ করেছেন যে মোষের লাঙলে বাৎসরিক দুই আনা এবং গরুর লাঙলে বাৎসরিক দুই পয়সা হারে সাঁওতালদের রাজস্ব দিতে হবে। সুদের হার হবে টাকা প্রতি বাৎসরিক ১ পয়সা। এই বিদ্রোহীরা যখন থেকে অত্যাচারী নায়েব - সুজাউল, পুলিশ এবং কোম্পানিরাজের আদালতকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ঠিক করল তখন থেকেই এই আন্দোলনের প্রকৃতি আস্তে আস্তে বদলাতে আরম্ভ করল। সাঁওতালরা আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিল যখন তা দেখল যে সমস্ত সাঁওতালরা মহাজনদের বাড়িতে হামলা করেছিল তাদের বিচারে শাস্তিও দেওয়া হল কিন্তু অত্যাচারী মহাজনদের এমনকি তিরস্কার পর্যন্ত করা হল না।[৩৪]

১৮ই আষাঢ়, ১২৬২ বঙ্গাব্দ শনিবার (৪টা জুলাই ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) সাঁওতাল বিদ্রোহীরা তাদের অভিযান শুরু করার আগে ভুগনাডিহি থেকে পাঁচেকেথিয়া বাজারে যান স্থানীয় দেবীর আরাধনা করার জন্য। তাদের আসতে দেখে ঐ বাজারের মহাজনরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল তাদের হাতে মাণিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত এবং হিরু দত্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।[৩৫] দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত তার দলবল নিয়ে ঐ জায়গায় ৭ই জুলাই পৌঁছলে বিদ্রোহিদের হাতে দারোগা নিজে মহাজন মানিকরাম, দুই জন বরকন্দাজ এবং কয়েকজন চৌকিদার (সবশুদ্ধ ৯ জন) নিহত হন।[৩৬] তারপরে তারা বরাহাইতের দিকে অগ্রসর হয়।

ক্ষিপ্ত সাঁওতালদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা চম্পট দিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারীরা প্রথমেই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করল। কেরিও ও কলগঙের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ওপর তারা পুরপুরি নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করল এবং ভাগলপুর ও রাজমহলের দিকে অগ্রসর হল।

ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যে ডাক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এই দুই শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। পীরপৈঁন্তি ও সকরিগলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়ক বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। পীরপৈঁন্তি থেকে যারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় তাদের কয়েকজন পরে জানায় যে, বিদ্রোহীরা সদর্পে ঘোষণা করেছে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়েছে; তাদের সুবেদারি চালু হয়েছে।

মেজর বারোজকে পীরপৈন্তি থেকে নির্দেশ দেওয়া হল। পীরপৈন্তির কাছে এক ভয়ানক যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ২৫ জন সৈন্য ও আধডজন সামবির আধিকারিকদের ফেলে সে পালায়। পরবর্তী সময় সে জানায় বিদ্রোহীরা তাদের মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শুধু হাতে নয়। পা দিয়েও মাটিতে বসে তীর - ধনুক ছুঁড়ছিল ও কুড়ুল নিয়ে যুদ্ধে চড়াও হয়েছিল।

মেজর শাকবার্গের (Shuckburgh) নেতৃত্বে পাহাড়ী সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পাঠানো হল। রেল চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সরকার প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃপ্রতিম লোকজনের বলে আরও বলীয়ান হয়ে সাঁওতালবাহিনী সংগ্রামপুরের দিকে অগ্রসর হল এবং সেখান থেকে সিদো, কানহু, চাঁদ ও ভৈরোর নেতৃত্বে তারা পাকুড়ের চারপাশে অবরোধ গড়ে তুলল। তিনদিন পর তারা পাকুড় দখল করল। ওই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা ধনী মহাজন দীনদয়াল রায় অতি স্থূল ব্যক্তি হওয়ায় পালাতে পারেনি। তার ভৃত্য জগন্নাথ সর্দার, যাকে প্রায় দাসত্বে রাখা হয়েছিল, সে তাকে ধরে নিয়ে এল এবং সাঁওতালদের সামনে হাজির করল। জগন্নাথ তার আজীবন দাসত্বের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীনদয়াল রায়ের প্রতিটি অঙ্গ টাঙ্গি দিয়ে একটু একটু করে কাটতে উল্লাসে বলে উঠল ঃ ''এইসব আঙ্গুল দিয়ে তুই সুদ আর অসদুপায়ে রোজগার করা টাকা গুনেছিস। এই হাত দিয়ে তুই ক্ষুধার্ত গরিবের অন্ন কেড়ে নিয়েছিস।'' দীনদয়ালের কর্তিত মস্তক নিকটবর্তী শিব চক্রপাণিশ্বরের মন্দিরের কুলুঙ্গিতে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

তখন সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতি আক্রমণ হানল। ১৩নং বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস্, ৭নং বাহিনী নিয়ে লেফটেন্যান্ট লোকার্ত, ৪২নং বাহিনী নিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিপট্রাপ সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল।

ক্যাপ্টেন পেরউইল ৪০নং বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং ২৯শে জুলাই-এর পরবর্তীকালে এক সরেরের সময় ১২টি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে। মেজর শাকবার্গ দক্ষিণ-পশ্চিমে দিদার দিকে রওনা দিল এবং উত্তর - পশ্চিমে ঘুরে খোনিরা হয়ে যেতে যেতে লোহুন্দিয়ার পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ১৫টি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে এবং ওই অঞ্চল বিদ্রোহীমুক্ত করে ফেলে। ২৯ জুলাই

বিকেলে মেজর বারো সাঁওতাল গ্রাম মুনহান ও মুনকাতরো ধ্বংস করার জন্য লেফটেন্যান্ট গর্ডনের সঙ্গে এক সেনাবাহিনী পাঠালো। পরের দিন লেফটেন্যান্ট রুবি উত্তর - পশ্চিম দিকে পথ পরিবর্তন করে ডুজ্জা, তিতেরিয়া, বস্কুদার, রঙ্গোকিট্টা, লুরিয়ালিয়া ও বোকাই - এই গ্রামগুলি ধ্বংস করে। সব মিলিয়ে ৩৬টি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস হয়।[৩৭]

সংগ্রামী সাঁওতাল কৃষকদের রক্তে রাজমহলের পাহাড়ী এলাকা ভেসে গেল। সাঁওতাল কৃষকরা গ্রাম বিধ্বংসের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও তাদের ঘরবাড়ি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অদম্য সাহেসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াল।

সাঁওতালরা ২৫শে জুলাই kyth ভাষায় (হিন্দিরই একটি রূপ) একটি লিখিত ঘোষণা (manifisto) ভাগলপুর ও পূর্ণিয়াতে প্রকাশ করে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, মহাজন ও আমলাদের অপরাধ খুবই বেশী এবং সাহেবরা অনুসন্ধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাদের অধস্তন কর্মচারীদের উপর যারা নিজেরাই উৎপীড়ন করে আসছে। তার ফলে তাদের চরিত্রের এবং আচরণের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে।[৩৮]

৬ই আগস্ট নদিয়ার ডিভিশনাল কমিশনার A.C. Bidwell কে ওই ''অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে দমন করার জন্য এবং ওই অশান্ত জেলাগুলিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে'' স্পেশাল কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৭ই আগস্ট বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের জন্য Bidwell একটি সরকারী ঘোষণা (Proclamation) জারি করেন। এই ঘোষণার সমস্ত বিদ্রোহীদের দশ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় এবং প্রচার করা হয় যে আত্মসমর্পণ করলে নেতাদের ও যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আছে তাদের বাধ দিয়ে বাকি সকলকে ক্ষমা করা হবে। ঘোষণাটির বয়ান এইরূপ ছিল ঃ

...রাজবিদ্রোহ কর্ম্ম করিয়া অত্র দেশ লুট ও উজাড় করিতেছে— আর সৈন্যের সহিত আপত্য করিতেছে— উদারদিগের মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তি আছে যে আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম জ্ঞান করিয়া মার্জ্জনা ও পূব্বাকারাবস্থা পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে—এ বিষয় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে গভর্ণমেন্ট সর্ব্বদা আপনার প্রজার সুখ...তাহারা মন্দলোকের পরামর্শে কুপথগামী হয় ইচ্ছুক নয় এ নিমিত্ত কেবল এই সকল ব্যক্তী জাহারা প্রধান মন্ত্রী ও সরদার কিম্বা কোন খুন করিতে প্রাধান্যরূপে অধিক থাকা প্রকার হইবেক তদ্বিতিরিক্ত সকল সাঁওতালগণ জাহারা ১০ দশ দিবসের মধ্যে কোন হাকিমের সম্মুকে হাজীর হইয়া আজ্ঞাবাহী হইবেক তাহাদিগের দোশ মার্জ্জনা করা জাইবেক— জখন তাহাদের আজ্ঞাবাহী যুক্ত প্রকাশ হইবেক তখন তাবত নালিশ সাঁওতালদিগের যাহা প্রমাণযোগ্য হইবেক তাহা সুন্দররূপে তদারক করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি সকল রাজদ্রোহি এই ইস্তাহার জাহির পর বিপরিত আচরণ করে তাহার সক্ত ও নিদারুণ সাজা পাইবেক। ইতি সন ১৮৫৫ সাল— তাং ১৭ই আগষ্ট — মোতাক সন ১২৬২ সাল— ২ ভাদ্র।[৩৯]

এই ঘোষণা সাঁওতালরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। ঘটনাচক্রে সিদো ১৯শে আগস্ট ধরা পড়েন।

মাসখানেক শান্ত থাকার পর বিদ্রোহীরা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আবার পুরোদমে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ে। বিদ্রোহ দমনের এত ঘটা, বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়োগ, আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষণা ইত্যাদি সত্ত্বেও যখন মাসের পর মাস বিদ্রোহের আগুণ জ্বলতেই থাকল তখন সরকার ১০ নভেম্বর সামরিক আইন জারি করল। সামরিক আইন জারি হল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ভাগলপুর জেলার সমগ্র এলাকায়।

ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র এলাকায় এবং সারা বীরভূম জেলায়।

তারপর মেজর - জেনারেল লয়েড-রের নেতৃত্বে চোদ্দ হাজার সৈন্য সারা বিদ্রোহ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সাঁওতালদের ঘেরাও করতে থাকে। ৩১শে ডিসেম্বর সরকার ঘোষণা করে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা হয়েছে। ৩রা জানুয়ারি সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু তার পরেও তিন মাস পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি এলাকায় বিদ্রোহের জের চলতে থাকে।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর হাজারিবাগ অভিমুখে পালাবার সময় জারোয়ার সিং নামে এক ঘাটোয়াল সর্দারের তৎপরতায় কানহু, তাঁর দুই ভাই এবং সঙ্গীসাথীরা ধরা পড়েন।[৪০] তাঁদেরকে প্রথমে ওপরবাঁধে, তারপরে রানিগঞ্জে এবং সেখান থেকে সিউড়িতে পাঠানো হয়। ১ ডিসেম্বর তারযোগে চারিদিকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়— সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কানহু ধরা পড়েছেন। খবর পেয়ে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর Frederick James Halliday পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

কানহু ও তাঁর অপর দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, লুণ্ঠন, অত্যাচার এবং কানহুর বিরুদ্ধে মানিকরাম মহাজনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪,১৫,ও১৬ জানুয়ারী স্পেশাল কমিশনার এলিয়টের এজলাসে তাঁদের বিচার হয়। বিচারে কানহুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং চাঁদ ও বাইরোকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।[৪১] বাংলার লেঃ গভর্নর হ্যালিডের আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্য কড়া পাহারায় কানহুকে ভাগনাডিহিতে নিয়ে যাওয়া হল। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সেখানে প্রচুর সৈন্য মোতয়েন করা হল। যে ঠাকুরবাড়িতে কানহু - সিদোর বিদ্রোহের সূচনা সেখানেই ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী বেলা পৌনে দুটো নাগাদ কানহুকে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী বেলা পৌনে দুটো নাগাদ কানহুকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর দৃঢ়তা ও মানসিক প্রশান্তি অক্ষুন্ন ছিল। পয়তাল্লিশ মিনিট তাঁর দেহটি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখার পর সেটিকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সুসভ্য ইংরেজ সরকার কানহুর মৃতদেহটি তাঁর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেবার সৌজন্য পর্যন্ত বোধ করেনি।

ড. কালিকিঙ্কর দত্তের মতে কানহু ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ ওপরবাঁদের কাছে কুজরার সর্দার ঘাটোয়াল দ্বারা ধৃত হন এবং তার কিছু দিনের মধ্যে তাঁর ফাঁসি হয়।[৪২]

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট সিদো ধরা পড়েন। তাঁর নিত্যসহচর নাজিয়া মাঁঝি ও ভুগন মাঁঝির সহযোগিতায় মেজর শাকবার্গ তাঁকে বন্দি করেন।[৪৩] ভাগলপুরের সেশন জজ সিদোর বিচার শেষ করে চূড়ান্ত নিস্পত্তির জন্য সদর আদালতে পাঠান। সদর আদালত সিদোকে ফাঁসির আদেশ দেয়। কেবল সিদো নয়, পুর্তো মাঁঝি সহ তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়। লেঃ গভর্নর হ্যালিডে তাঁদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করেন। বাংলা সরকারের সচিব ৫ ডিসেম্বর ভাগলপুরের কমিশনার বিডওয়েলকে এই আদেশের কথা জানান।[৪৪] সচিবের পত্রে এই বিষয়গুলি উল্লেখ ছিল ঃ

১। সিদো যেখানে মহেশ দারোগাকে হত্যা করেছিল সেই বীরু বা বাবুপুরে সিদোকে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পুর্তো মাঁঝি ব্যতীত অন্যদেরও ওই স্থানে ফাঁসি দিতে হবে।

২। পুর্তো মাঁঝিকে কলগাঁয়ের নিকট চন্দ্রপুরে, যেখানে সে একটি হিন্দু পরিবারকে হত্যা করেছিল, সেখানে ফাঁসি দিতে হবে।

৩। ফাঁসির খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

৪। দামিনিকো ছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে নোটিশ দিতে বলা হয়।

৫। একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁর মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে ফাঁসির দিনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিদোর ফাঁসি হয়। অপর এক মত অনুযায়ী সিদো সম্মুখ সংঘর্ষে প্রাণত্যাগ করেন।

বহুসংখ্যক সাঁওতাল কৃষককে পণবন্দি ও কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। স্পেশাল কমিশনার A.C. Bidwell বাংলা সরকারকে ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এক চিঠিতে সাঁওতাল বন্দিদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু সাথীদের হাজির করার অসুবিধার জন্য হয়ত কিছু দেরীতেও হতে পারে বলে জানিয়ে দেন।[৪৫]

কালিকিঙ্কর দত্ত উল্লেখ করেছেন, ''সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনারের রেকর্ড অফিসে সাঁওতাল বন্দীদের বিষয়ে দুটি বড় ফাইল আছে। আমি একটি নথি থেকে দেখেছি যে সাঁওতাল পরগনার কমিশনার অনেক বন্দীদের বিচার করেন। এইসব বন্দীদের সংখ্যা প্রথমদিকে ছিল ২৫৩। কিন্তু তার মধ্যে ২ জন বিচারের সময় রাজসাক্ষী হয়। বাকি ২৫১ জন (সাঁওতাল ১৯১, ল্যাস ৩৪, ডোম ৫, ধাঙ্গার ৬, কোল ৭, গোয়ালা ১, ভুইয়া ৬, রাজওয়ার১) ৫২টি গ্রামের বাসিন্দা ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জনকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বাকিদের লুঠপাঠের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। এই কাজে কমিশনারকে সাহায্য করেন assessor -রা। যাঁরা সকলেই ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান এবং তাদের মধ্যে ২জন ছিলেন সাঁওতাল। ২৪৮ জন বন্দীর মধ্যে ৪৬ জন ছিল বালক যাদের বয়স ৯ থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যে ছিল। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রাখার জন্য যেমন বেত মারা হয় সেই রকম বেত মেরে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে চারদিনের খাবারও দিয়ে দেওয়া হয়। বাকিদের সাত থেকে চোদ্দ বছরের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৪৬]

নিম্নে লিখিত সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জি থেকে বিদ্রোহে ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

৩০জুন, ১৮৫৫ঃ ডাগনাডিহি গ্রামে (বর্তমান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত) বিশাল সমাবেশ সিদো - কানহুর ভাষণ এবং শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দশ হাজার সাঁওতালের শপথ গ্রহণ এবং কলিকাতা অভিমুখে প্রথম গণ - পদযাত্রা।

১৮ আষাঢ়, ১২৬২ বঙ্গাব্দ (৪ জুলাই, ১৮৫৫)ঃ বিদ্রোহী সাঁওতালগণ দেবীর আরাধনার জন্য পাঁচকেথিয়া বাজারে সমবেত হন।

৭ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ দিঘি থানার অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত, দুইজন বরকন্দাজ, কয়েকজন চৌকিদার এবং কুখ্যাত মহাজন মাণিকরাম ভকত সিদো - কানহু ও তাঁদের ১৯ জন সঙ্গীর হাতে মৃত্যুবরণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়।

১১ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীসহ মেজর F.W. Burroughs-এর করগাঁ আক্রমণ।

১২ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ সিদো, কানহু, চাঁদ ও ভাইরোরে নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের পাকুড়ে প্রবেশ এবং রাজবাড়ি আক্রমণ।

১৩ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ পুকুড়ের কাছে তারই নদী তীরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেভন্থ্ রেজিমেন্টের সামনা - সামনি যুদ্ধ। যুদ্ধে সাঁওতাল বাহিনীর পরাজয়।

১৬ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ বিদ্রোহীদের কাছে Major Burrough -র পরিচালিত ব্রিটিশ সৈন্যের পিরপৈতি অঞ্চলে পরাজয়।

২০ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ এই সময় থেকে বিদ্রোহ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ - পূর্ব বীরভূমের তালডাঙ্গা এবং সাঁইথিয়া থেকে ভাগলপুর হয়ে রাজমহল অঞ্চল জুড়ে বিস্তার লাভ করে।

২১ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ কাতনা গ্রামে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় স্বীকার।

২৩ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ বীরভূমের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র নাগপুর বাজার ধ্বংস।

২৪ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ বারহাওয়া বারহাইত রাস্তায় রঘুনাথপুর অঞ্চলে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট Toogood-র পরিচালিত ইংরেজ সৈন্যের কাছে চাঁদ ও কানহুর পরাজয়।

২৫ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ সাঁওতালেরা ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া অঞ্চলে Manifesto দাখিল করেন।

২৭ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ Lieutenant Taulmain এবং ১৩ জন সিপাহী বিদ্রোহীদের হাতে মারা যান।

২৯ জুলাই, ১৮৫৫ ঃ Captain Sherwill কর্তৃক মুনহান ও মুনকাতরো গ্রাম সমেত ১২টি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস।

আগস্ট২, ১৮৫৫ ঃ Lieutenant Rubin কর্তৃক আর সাতখানি গ্রাম ধ্বংস। Major Shuckburgh কর্তৃক ১৫টি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস।

আগস্ট ৬, ১৮৫৫ ঃ নদিয়ার ডিভিশনাল কমিশনার A.C. Bidwell কে কে বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেশাল কমিশনার হিসাবে নিয়োগ।

আগস্ট ১৭, ১৮৫৫ ঃ ইংরেজ সরকার কর্তৃক আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্র প্রচার ও সাঁওতালদের এই ঘোষণা প্রত্যাখান।

আগস্ট ১৯, ১৮৫৫ ঃ নাজিয়া মাঁঝি ও ভূগন মাঁঝির বিশ্বাসঘাতকতায় সিদো Major Shuckburgh -র হাতে ধরা পড়েন।

সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ঃ মোচিয়া কাঁসজোলা, রাম ও স্বন্দ্রা মাঁঝির নেতৃত্বে ওপরবাঁধ থানা ও গ্রাম লুঠ।

নভেম্বর ১০, ১৮৫৫ ঃ ইংরেজ সরকার কর্তৃক সামরিক আইন জারি।

নভেম্বর ৩০, ১৮৫৫ ঃ কানহু ও তাঁর দুই ভাই চাঁদ ও ভাইরো তাদের সঙ্গীসহ জারোয়ার সিং নামে কে ঘাটোয়াল সর্দারের তৎপরতায় ধরা পড়ে।

জানুয়ারি ৩, ১৮৫৬ ঃ সামরিক আইন প্রত্যাহার।

জানুয়ারি ১৪, ১৮৫৬ ঃ বারহাইতের কাছে বারমাসিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার এবং এই সময়ে সংগ্রামপুরের ইউরোপীয় ফ্যাক্টরী আক্রান্ত হয়।

জানুয়ারি ১৪,১৫,ও১৬, ১৮৫৬ ঃ কানহুর বিচার স্পেশাল কমিশনার এলিয়টের এজলাসে।

জানুয়ারি ২৩, ১৮৫৬ ঃ সুজারামপুরের গ্রান্ট সাহেবের কুঠি লুঠ।

জানুয়ারি ২৭, ১৮৫৬ঃ Leutenant Fagan পরিচালিত ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে সাঁওতালদের পরাজয়।

ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সপ্তাহ, ১৮৫৬ ঃ সিদোর ফাঁসি অথবা এক সম্মুখ সংঘর্ষে সিদোর প্রাণত্যাগ।

ফেব্রুয়ারি ২১/২২, ১৮৫৬ ঃ বীরভূমের সাঁওতালগণ করুকাতারা পরগণার বেশ কিছু মহাজনের সম্পত্তি আটক করেন।

ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৮৫৬ ঃ ভাগনাডিহিতে বেলা পৌনে দুটোর সময় কানহুর ফাঁসি হয়।

।। তিন।।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, যা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে পরিচিতি লাভ করেছে, তার অনেক আগে থেকেই কোম্পানিরাজের বিরুদ্ধে অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানা কারণে। বস্তুত ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই একটানা কোনো না কোনো সশস্ত্র অসন্তোষ সামাল দিতে হয়েছে কোম্পানির - রাজকে এবং পরে ব্রিটিশ সরকারকে। আর তীব্র এই প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল ভারতের আদিম জনগণ - আদিবাসীরা।

''আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটেছে অগণ্য ঃ সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখের দাবি রাখে। এ ছাড়াও আরও অসংখ্য ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটেছিল ঃ চুয়াড় (ঘাটশিলা ও বরাভূমের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী) বিদ্রোহ - ১৭৭০ ও ১৭৯৮-৯৯, খাসি বিদ্রোহ - ১৮০৪-১৮৩৮, ত্রিবাঙ্কুরের ধেওয়ান ভেলু তামশির নেতৃত্বে খান্দেশের আদিবাসীদের বিদ্রোহ - ১৮০৮, জাট বিদ্রোহ - ১৮০৯, সাহারণপুরের গুজার বিদ্রোহ - ১৮১৩, খন্দেশের ভীল বিদ্রোহ - ১৮১৮, গোপাল সিং ও দিবাকর দীক্ষিতের নেতৃত্বে বুন্দেলখণ্ডীদের বিদ্রোহ - ১৮২৪, কিট্টুর (বেলগাঁও) বিদ্রোহ - ১৮২৪, কোল বিদ্রোহ - ১৮৩১-৩২, মানভূমের ভূমিজ বিদ্রোহ - ১৮৩২, ভিজিয়ানাগ্রামের নেতৃবর্গের বিদ্রোহ - ১৭৯৪-১৮৩৪, নাগা বিদ্রোহ - ১৮৩৯, আন্নাসাহেবের নেতৃত্বে কোলাপুর বিদ্রোহ - ১৮৪৪, ওড়িশার খোণ্ড বিদ্রোহ - ১৮৪৬, এবং ব্রিটিশ শাসকদের যা সবচেয়ে বেশি বেগ দিয়েছিল সুদু - কানহু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বেধীন সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ - ১৮৫৫ এবং মুণ্ডা বিদ্রোহ - ১৮৫৭।[৪৭]

১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজ পধানত বাংলায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী ধনিকতন্ত্র - সমাজতন্ত্র, জমিদার ও মহাজনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একের পর এক কৃষক সংগ্রাম ও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল।[৪৮]— সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), মেদিনীপুর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), চামকা বিদ্রোহ (পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৭৭৬-৮৭), পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (বীরভূম - বাঁকুড়া ১৭৮৯-৯১), দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-৯৯), নীলচাষের সংগ্রাম (১৮৩০-৪৮), মৈমনসিংহের গারো জাগরণ (১৮৩৭-৮২), নায়েক বিদ্রোহ (মদিনীপুর, ১৮০৬-১৬), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), ফরাজী বিদ্রোহ (ফরিদপুর ১৮৩৮-৪৮), ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০), এ ছাড়াও কয়েকটি আদিবাসী বিদ্রোহ হয়েছিল—সেগুলি হল - মানভূমের ভূমিজ বিদ্রোহ (১৭৯৫-১৮০০), সিংভূমের হো কোল বিদ্রোহ (১৮৩২), সরদার লড়াই (১৮৫৫), হাজংড় বিদ্রোহ ইত্যাদি।

আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল গণ - সংগ্রামই ছিল শ্রেষ্ঠতম। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, চল্লিশ বৎসরব্যাপী ওয়াহাবী আন্দোলন ও ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরেই সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং এটি ছিল ভারতের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূতস্বরূপ। জমিদার গোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের আর এক প্রধান শত্রু মহাজনগোষ্ঠীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত সাঁওতাল বিদ্রোহেই আমরা প্রথম দেখতে পাই। তাঁরাই নিজেদের জীবন দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষকের এক নতুন মহাশত্রুর দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ ঊনবিংশ শতাব্দী ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর এমনকি বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর কৃষকের মহাজন - বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করে গেছে। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায় ''ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ সহস্র সাঁওতাল তীর - ধনুক - টাঙ্গি - তরবারী কামান - বন্দুক সজ্জিত পনেরো সহস্রাধিক সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতের জনগণের সম্মুখে যে পথনির্দেশ করিয়াছে, সেইপথ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতা - সংগ্রামের সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিণত হইয়াছে। সেই রাজপথ বিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া প্রসারিত। ভারতবর্ষের কৃষক সেই রাজপথেরই অভিযাত্রী।[৪৯]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রাপ্য বলে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ''১৮৫৭-৫৮ সালে সাহাবাদে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, তার সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা, সংগঠন ও ভৌগোলিক অঞ্চলের বিষয়ে তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং ১৮৫৭ সালে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাকে যদি স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে মনে করা হয়, তাহলে সাঁওতালরা বা সুরেন্দ্র সাই এবং সম্ভবত আরও অনেকে যে কঠিন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তাঁদেরও সেই একইরকম মর্য্যাদা দিতে অস্বীকার করা যায় না।''[৫০]

মার্কসবাদী কবি ও আদিবাসী নেতা উপেন কিস্কু সাঁওতাল বিদ্রোহকেই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, ''এটা কি অস্বীকার করা যায় সাঁওতাল বিদ্রোহের গভীরতা, ব্যাপকতা, শোষণমুক্তির শিকড় ধরে টান দেওযার ঘটনা, পঁচিশ হাজার মানুষের জীবনদানের ঘটনা ভারতবর্ষের আর কোন বিদ্রোহে ঘটেছে? সিপাহী বিদ্রোহের দু-বছর আগে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হবে না? সিপাহী বিদ্রোহীদের মনে কি এ ঘটনার কোন প্রভাব ছিল না? তাঁদের মনে কি এ প্রশ্নের উদয় হয়নি যে, অসংগঠিত সাধারণ তীর - ধনুক নিয়ে সাঁওতাল আদিবাসীরা যদি আট মাসব্যাপী শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারে, তাঁরা যদি আত্মত্যাগের মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে সংগঠিত আধুনিক অস্ত্রধারী সিপাহীরা কেন ব্রিটিশশক্তিকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। এক কথায় বলতে হয় সিপাহীদের প্রেরণা যোগানোর কাজ করেছিল ঐতিহাসির সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নেওয়ার যোগ্যতামানে উত্তীর্ণ হতে পারবে।[৫১]

সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বীকৃতি পাক আর নাই পাক এটি অনস্বীকার্য্য যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভিক যোদ্ধা তারই।'' সাঁওতাল বিদ্রোহ একদিনে সংঘটিত হয়নি। শাসন - যন্ত্রের অব্যবস্থা এবং সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণ হঠাৎ করে একদিনে ঘটেনি। এর প্রক্রিয়াস্বরূপ এই আন্দোলনের পিছনে ছিল এক ধারাবাহিক সংগ্রাম যাকে সক্রিয় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল এক বলিষ্ট নেতৃত্ব। সাংগঠনিক প্রয়াস একেবারে ছিল না ভাবা ঠিক নয়। নতুবা আট মাস ধরে কোনও বিদ্রোহ তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এবং স্থানীয় প্রভুদের বিরুদ্ধে চালনা করা সহজ নয়। এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বিরাট অঞ্চল জুড়ে। সাঁওতালরা এই মুক্তি যুদ্ধ দেখেছিলেন নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজেদের ভাষায়, নিজেদের চেতনা অনুযায়ী। নিজস্ব সামাজিক কাঠামো, জীবনদর্শণ, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা এই বিদ্রোহ সংঘটিত ও পরিচালিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। সাঁওতালদের শক্তির মূল উৎস হচ্ছে 'সামাজিক সহযোগিতা' সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধাপে ধাপে তৈরি করা হয়েছিল 'সমাজকেন্দ্রিক' রূপে। যৌথ জীবনযাত্রাই হল মূলমন্ত্র। তাঁদের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, তাঁদের সৌন্দর্যবোধ, নৃত্য, গীত, মানসিক গঠন সবই সমাজকেন্দ্রিক। তাঁদের গ্রাম্যজীবনের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসন কাঠামোকে তাঁরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর নির্দেশেই তাঁদের জীবনযাত্রা পরিচালিত হত। তাঁদের বাসস্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তাঁদের শিকার জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁদের তৎকালীন গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী করে তুলেছিল। এই কৌশল অবলম্বন করেই তাঁরা আধুনিক অস্ত্র - শস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে বহু ক্ষেত্রে

পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫২]

সাঁওতাল যুবকরা ছিল এই বিদ্রোহের মূল শক্তি। সাঁওতাল কিশোর এবং বৃদ্ধরাও এই বিদ্রোহে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাঁওতাল মেয়েরা দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দেন। জেলে গিয়েছিলেন মেয়েরা ছেলে কোলে করে। সাঁওতাল মেয়েরা কেউ কেউ বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন ও 'সাঁওতাল ঠাকুরানীর' উচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন।[৫৩]

সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ায় সাঁওতালরাই স্বাভাবিকভাবে এই গণসংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি ছিল। কিন্তু সাঁওতালরা ছাড়াও এলাকার বাঙালি হিন্দু - মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগরেরাও এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম সমাজের একেবারে নিচু স্তরের মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে উঠেছিল এই বিদ্রোহে। সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়ে উঠেছিল সব সম্প্রদায়ের গরিব জনসাধারণের মুক্তি যুদ্ধ।

এই বিদ্রোহে কি শুধু যোগ দিয়েছিল সাঁওতাল কৃষকরাই? না, সাঁওতাল ছাড়া স্থানীয় অ-সাঁওতাল বাঙালি ও বিহারী হিন্দু ও মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগররাও অনেকেই তাতে যোগদান করে। তাদের মধ্যে ছিল কামার বা লোহার, কুমোর, তেলি, গোয়ালা, চামার, ভুঁইয়া, বাগদী, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতি বা বর্ণের হিন্দুরা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে মোমিনরা। তাদের যোগ দেবার কারণ চিল এই যে শ্রেণীস্বার্থের দিক দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের থেকে তাদের অবস্থার তেমন কোন তফাৎ ছিল না। জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণ ও জুলুম সাঁওতালদের মতো কম বেশী তাদের ওপরও চলতো, পুলিশ ও আইন - আদালতের নির্যাতন তাদের ভোগ করতে হত। ...লড়াইয়ে তাদের স্বার্থ ও সাঁওতালদের স্বার্থ ছিল মূলতঃ অভিন্ন।[৫৪]

বিদ্রোহে যে সকল অ-সাঁওতাল বাঙালি বা বিহারী ছিল তারা সাধারণত সাঁওতালদের মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কাজে যোগ দেয়নি। কিন্তু তারা যুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তৎকালীন বাংলা সরকারের সচিবকে ভাগলপুরের কমিশনার ২৮শে জুলাই ১৮৫৫ সাল তারিখে লেখা এক চিঠি মারফত জানান, গোয়ালা, তেলি এবং অন্যান্য জাতের লোকেরা সাঁওতালদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করছে। তাদের সংবাদ সরবরাহ করেছে, রণবাদ্য বাজাচ্ছে, কাজের পরামর্শ দিচ্ছে আর গুপ্তচরের ভূমিকাও পালন করছে। তাছাড়া লোহাররা তাদের জন্য তীর ও কুঠার তৈরি করছে। তাই কমিশনার সাহেব মনে করলেন যে তাদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জারি করা সমস্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞার আওতায় এই সব সম্প্রদায়ের মানুষদেরও অনতিবিলম্বে অন্তভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।[৫৫]

আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সাঁওতাল ও সহযোগী বন্দীদের প্রতি জেলরক্ষীদের সুস্পষ্ট সহানুভূতি। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রিডার্স থমসন বীরভূমের সেসন জজকে লেখেন, সমগ্র কারা প্রশাসনে কেবল গুরুতর শৃংখলার অভাবই ঘটেনি। জেলের কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্দীদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সহানুভূতিও বর্তমান। পরবর্তী আরও দুটি পত্রে তিনি জানান, কারারক্ষীদের সঙ্গে যোগসাজশের ফলে দুমকা জেল থেকে পালিয়ে গেছে এক বিরাটসংখ্যক সাঁওতাল বন্দী; আর সিউড়ি জেল থেকেও তারা যদি পালাতে চায় তবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভাষায়, 'আমি সুনিশ্চিত আমার বর্তমান জেলরক্ষীদের পক্ষ থেকে কোনো সক্রিয় প্রতিরোধই আসবে না। আমি দুঃখিত, এদের উপর আমি একেবারেই নির্ভর করতে পারি না।' তাঁর বিবেচনায়, সাঁওতাল বন্দীদের নিরাপদে চালান দেওয়ার মত বিশ্বস্ত রক্ষী সংগ্রহ করাও রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার।[৫৬]

এই সক্রিয় সমর্থন ছিল বলেই তদানীন্তন যুগের সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও আট মাস ধরে সাঁওতাল বিদ্রোহ টিকে থাকতে এবং এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত হতে সক্ষম হয়েছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে যে ভয়ানক সংকট দেখা দিয়েছিল, তার বড়ো প্রমাণ সেযুগের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিচিত্র সংবাদ। 'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র রিপোর্ট। এই প্রসঙ্গে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান ও কবিতা, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিয়েছেন ডঃ রণজিৎ কুমার সমাদ্দার তাঁর 'সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা দু-ধরনের পত্র সাহিত্য দেখতে পাই— এক ধরনের হল সরকারের কাছে নালিশ, আর এক ধরনের হল সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্র। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর' দুটি পত্রিকাতেই সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে পাঠক প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয় সেগুলিতে বিদ্রোহের ব্যাপকতা, তীব্রতা, সাঁওতালদের ঐক্যের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনই বিবৃত করা হয়েছে সাঁওতাল বন্দীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দুষ্টব্যবহারের কথা।[৫৭] দুটি পত্রিকার সম্পাদকই (ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত/ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ) যে সাঁওতাল বিদ্রোহ তথা কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন তা তাঁদের সম্পাদকীয় মন্তব্যেই পরিস্ফুটিত হয়েছে।

এই বিদ্রোহে সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ভাবলে খুব ভুল করা হবে। এলাকার জমিদার - মহাজন - ব্যবসায়ীরা সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে অর্থ, অন্ন ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছিল। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকার জনগণ এই বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি বরং সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্র, খবর এবং কিছু কিছু সংবাদপত্র যেমন Friend of India এবং Calcutta Review[৫৮] সাঁওতাল বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করার ওকালতি করেছেন। তা না করে যদি তাঁরা বিদ্রোহের পক্ষে দাঁড়াতে পারতেন তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হত।

মুর্শিদাবাদের নবাব থেকে শুরু করে রাণী রাসমণি পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিদ্রোহ দমন করার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৪০টি হাতি ২টি কামান, বহু সংখ্যক অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ দিয়ে ব্রিটিশবাহিনীকে সাহায্য করেন। হেতমপুরের রাজা ও অন্যান্য জমিদারও সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ''হাতি পাঠালেন শ্রী গোপাল পালচৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাণী রাসমণি, প্রাণনাথ চৌধুরী, রমাপ্রসাদ রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বর্ধমানের মহারাজ, সত্যচরণ ঘোষাল।''[৫৯]

এঁদের সম্মিলিত প্রয়াস সত্ত্বেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে যায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি ইংরেজ রাজশক্তির দমনমূলক অত্যাচারে। হাজার হাজার সাঁওতালকে হত্য করা হয়েছে, তাদের গ্রাম পুড়েছে গরু - বাছুর গেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহে শতকরা ৫০ জন নিহত হয়েছিল। অর্থাৎ ৫০ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো।[৬০] সিউড়ি শহরের কেন্দুয়াডাঙ্গায় সহস্রাধিক বন্দী সাঁওতালকে গণফাঁসি দেবার কথাও শোনা যায়।[৬১] মেজর জারভিসও তাই স্বীকার করেছেন, ইংরেজ সেনাবাহিনী যা করেছে, তা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা (Genocide)[৬২]

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার ওপর এই বিদ্রোহ এমন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল যে সেটা বিটিশ পার্লামেন্টেও আলোচিত হয়েছিল এবং ইউরোপেও বিভিন্নভাবে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আমেরিকায় সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারই ফলে সাঁওতালদের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি

আকর্ষিত হয়েছিল।[৬৩]

সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে 'সাঁওতাল পরগণা' জেলার সৃষ্টি হল। এই জেলা প্রশাসনের ব্যাপারে বিশেষ আইন - কানুন প্রচলিত হয়। এর মাধ্যমেই সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে সুচতুর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা 'পৃথকীকরণ নীতি' প্রয়োগ করতে শুরু করে। তাদের আফ্রিকার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজে লাগে। Indian Home Mission to the Santals প্রতিষ্ঠা করে সাঁওতালদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা শুরু হয়। ভারতীয় সংস্থার প্রবেশ নিষেধ ছিল এই অঞ্চলে। 'পৃথকীকরণের নীতির সঙ্গে সঙ্গে' বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজও সুকৌশলে রোপণ করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর Divide and Rule নীতি খুব সযত্নে ও সুচতুরভাবে ভারতীয় চিন্তন ও মননে অনুপ্রবেশ করিয়া দেওয়া হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শোষণমুক্ত সাঁওতালদের রাজ প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি রেপোর্টেও শাসকবর্গ একই মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থে লেখা আছে— সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাঁওতালদের স্বাধীনতা - স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল ঃ তাদের নিজ দলপতির অধীন স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।[৬৪]

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে জুন ভাগনডিহিতে সাঁওতালরা যে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল তা দেশের অন্যান্য প্রান্তেও পৌঁছে গিয়েছিল —যার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় ১৮৬০ -এর নীল চাষীদের বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৫ পাবনা ও বগুড়ার রায়ত অভ্যুত্থানে, ১৮৭৫-৭৬ -এর পুনা ও আহমেদনগরের মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থানে। স্বাধীনতার ষাট বছরেরও পরে (এবারেই ৬০-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল) মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুরু হয়েছে বাস্তু ও কৃষিজমি বাঁচানোর আন্দোলন, জঙ্গল ও পাহাড় থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। নানা 'সুরক্ষা সমিতি' অথবা 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে হয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় অথবা অরাজনৈতিকভাবে। সকলেরই এক প্রতিজ্ঞা কোনভাবেই জমি - জঙ্গল-পাহাড় থেকে কাউকেই জোর করে উচ্ছেদ করা যাবে না। মূলমন্ত্র এক— জমি, জঙ্গল, পাহাড় যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে, তার জন্য যদি প্রাণ বলিদান দিতে হয় তাও ভাল। আজ থেকে ১৫০ বছরেরও আগে শহিদ সাঁওতাল কৃষকরা সংগ্রামী বীরত্ব ও আত্মহত্যার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা বর্তমানে যাঁরা জমি - জঙ্গল - পাহাড় বাঁচাবার লড়াই করছেন তাঁদের ওপর কি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করেছে?

সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল জমিদার-মহাজন এবং তাদের মদতদাতা ইংরেজ সরকারের অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে। সে সংগ্রাম দরিদ্র-মুক্তির সংগ্রাম। ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহ আজ এক বিশেষ প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তাই ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তেই অর্থনৈতিক - সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার ফিরে পারবার দাবিতে যে কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়। সেখানেই যেন সাঁওতাল বিদ্রেহের দীর্ঘ ছায়ার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়।

তথ্য নির্দেশঃ

১। বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, পৃঃ ২৮।
২। ঐ, পৃঃ ২১।
৩। ঐ, পৃঃ ২১।
৪। ঐ, পৃঃ ৮।
৫। Captain Walter Sherwell, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1851
৬। Abhay Charan Das, The Indian Ryat (Calcutta, 1881) PP 569-5
৭। Kalikinkar Datta, The Santhal Insurrection of 1855-57 (Calcutta, 1804)PP2-3
৮। F.B. Bradley Birt, The Story of an Indian Upland, Chapter VI, London, Smith, Elder & Co.1905
৯। Kalikinkar Datta, Op. Cit, P.2
১০। ধীরেন্দ্রনাথ বস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১৮।
১১। Datta, Op. Dit. P-3
১২। Letters from Durbor, Collector of Bhagalpur to the Commissioner of Revennue, Bhagalpur, Dated 28 Sept. 1836 quoted by রনজিৎ কুমার সমাদ্দার, ''একটি কাহিনীকাব্যও সাঁওতাল গণযুদ্ধ', পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ১১, ২০০৫। প.ব. সরকার, P - 159
১৩। Datte, op.cit P-3
১৪। The Calcutta Review, 1856 P - 238
১৫। Datta, op. cit P- 4- 5
১৬। The Calcutta, Review, 1856 P - 241.
১৭। W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal, New Delhi, Cosmo Publication, 1975, P - 280
১৮। Datte, op.cit P-5
১৯। Ibid, P-6
২০। Ibid
২১। The Calcutta Review, 1856, P-240
২২। Hunter, op.cit P-230
২৩। তাপস চক্রবর্তী, হুল ঃ এক সশস্ত্র প্রতিবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ১১, ২০০৫, পৃঃ -

১৭০, পঃ বঃ সরকার।
২৪। Judicial Proceedings No. 157, dt. 14-2-56
২৫। Datta, op.cit P-11-12
২৬। The Calcutta Review, 1856, P-241.
২৭। Datte, op.cit P-12-13
২৮। Ibid P-13
২৯। Letter from the Commissions of Bhagalpur to the Secretary to the Government of Bengal, dated 9th July, 1855, para 4, cited by Datta, Ibid.P-15.
৩০। Judicial Proceedings No. 221 dt 23-8-1855.
৩১। E. G. Man, Santhalia and the Santhals, 1876, London.
৩২। Datta, Op. Dit. P-16
৩৩। Ibid P - 13
৩৪। Ibid P - 13
৩৫। Ibid P - 13
৩৬। Letter from the Commissions of Bhagalpur to the Secretary to the Government of Bengal, dated 9th July, 1855, para 4, cited by Datta, Ibid.P-17.
৩৭। এই ঘটনার বিবরণ এর বই থেকে নেওয়া হয়েছে।
৩৮। Datta, Ibid. P-8
৩৯। Ibid. P-86
৪০। Judicial Proceeedings No. 131 dt 20-12-1855.
৪১। Judicial Proceeedings No. 131 dt 20-12-1855.
৪২। Datta, Op cit P-67
৪৩। রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, একটি কাহিনী কাব্য ও সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৪৫ বছর ঃ উপরোক্ত পৃঃ ১১২-১১৩।
৪৪। Judicial Proceedings No. 113 dt. 6-12-1855
৪৫। Datta, op Cit P 60
৪৬। Ibid, P - 68
৪৭। Kalicharan Ghosh, The Yall of Honour. P - 10
৪৮। অমল কুমার দাস ঃ সাঁওতাল গণসংগ্রাম; গতি ও প্রকৃতি, পসিচমবঙ্গ, সাঁওতাল বিদ্রোহে ১৪৫ বছর ঃ উপরোক্ত পৃঃ ১১২ - ১১৩।
৪৯। সুপ্রকাশ রায়, ১৯৬৬, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, পৃঃ ৩৩৯ - ৩৪১।
৫০। R.C. Mazumder, British Paramountcy and Indian Renisasance, Ist Part, P - 624.
৫১। উপেন কিস্কু, সাঁওতাল বিদ্রোহের সার্ধশত বর্ষ ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বলতম ভিত্তিভূমি, পশ্চিমবঙ্গ। সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর ঃ উপরোক্ত পৃ - ১৮৮।
৫২। অমল কুমার দাস, সাঁ্যতাল গণসংগ্রাম, ! গতি ও প্রৃতি, পশ্চিমবঙ্গ। সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর ঃ উপরোক্ত, পৃঃ ১১৭,
৫৩। নরহরি কবিরাজ ঃ ১৯৮০, সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রকৃতি, সাঁওতাল বিদ্রোহে থেকে অপারেশন বর্গা, পৃঃ ১৩, পঃ বঃ সরকার কলকাতা।
৫৪। তারাপদ রায় ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ২২।
৫৫। Datta, Op Cit P-16
৫৬। ড. রঞ্জন গুপ্ত, ১৯৮০, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে, সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে অপারেশন বর্গা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ২৩।
৫৭। ড. শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৭, 'বাংলা সাহিত্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী আন্দোলন ঃ সম্পাদনা - ড. অমল কুমার দাস ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, পঃ বঃ সরকার, কলকাতা, পৃঃ ৮৪-৯৩।
৫৮। Datta, Op cii P - 67
৫৯। স্বপন বসু, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলিকাতা, পুস্তক বিপণিণী, ১৯৮৪, পৃঃ ৫১।
৬০। ঐ, পৃঃ ১১৯।
৬১। ড. অমল কুমার দাস ঃ সাঁওতাল গণসংগ্রাম গতি ও প্রকৃতি ঃ উপরোক্ত পৃঃ ১১৬।
৬২। স্বপন বসু, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলিকাতা, পুস্তক বিপণিণী, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫।
৬৩। ড. অমল কুমার দাস ঃ সাঁওতাল গণসংগ্রাম গতি ও প্রকৃতি, উপরোক্ত পৃঃ ১১৫।
৬৪। Bengal District Gazetter for Santal Parganas, P. 48.